প্রাণের গান

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ভৌগোলিক অবস্থার কারণে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। একটি বিশেষ অঞ্চলের নিজস্ব ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, আচার-অনুষ্ঠানে নিজস্বতা রয়েছে। আঞ্চলিক পরিচয় বহনকারী সব বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি বা ধরনই হলো সংস্কৃতি। তাই বলা যায় আঞ্চলিক সংস্কৃতি হলো অঞ্চলভিত্তিক সংস্কৃতি বা জীবনধারা।

ষড়ঋতুর এই দেশে ঋতুকে কেন্দ্র করে অনেক অঞ্চলে অনেক রকম উৎসব উদ্‌যাপন হয়ে থাকে। আর সেইসব উৎসবের জন্য হয়ে থাকে নানা রকমের গান-বাজনা, পালা-পার্বণ। এইবার আমরা নদী, বর্ষাকে ঘিরে গান সম্পর্কে জানব। ভাটিয়ালি আর সারি গানের নাম আমরা হয়তো শুনে থাকব। চলো, আমরা এ সম্পর্কে পরিবার বা অন্য কোনো মাধ্যম থেকে জানার বা শোনার চেষ্টা করি।

ভাটিয়ালি গান

বাংলা লোকসংগীতে একটি অন্যতম ধারা হলো ভাটি অঞ্চলের ভাটিয়ালি গান। নদীর স্রোতধারা যেদিকে যায় সেদিককে ভাটি বলে। নদীবিধৌত বাংলার মানুষের প্রাণের এ গান হচ্ছে নৌকা, মাঝি, গুন-সম্পর্কিত গান।

ভাটিয়ালি গানের বৈশিষ্ট্য হলো এটি তাল-নির্ভর নয়। মন উদাস করা কথা ও সুরের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় এ গানে। নদীর বুকে নাও ভাসিয়ে দূর দেশে যাওয়ার ফলে প্রিয় জনের সান্নিধ্য পেতে মন আকুল করা গান আসে মাঝির কণ্ঠে। গানের মাঝে দীর্ঘ সুরের টান দেখা যায়। গলা ছেড়ে লম্বা টানে গাওয়া সেই গানে যেন মাঝির মনের সব আকুলতা আর আবেগ প্রকাশ পায়।

আবার ভাটির টানে নৌকা চলে সহজে। তখন নৌকা চালাতে বেগ পেতে হয় না। আর এই সহজ চলার গতি আর ছন্দে মাঝি দরদ দিয়ে গান গায়। বাংলার সহজ সরল মানুষের আবেগের সুরে গাওয়া এই গান আমাদের সংস্কৃতিকে ধারণ করে। এই গান চর্চার মাধ্যমে আমরা এই প্রাণের সুরকে বাঁচিয়ে রাখব।

সারি গান

সারি গান সারি শব্দ থেকে এসেছে। সারি গানের মূল বৈশিষ্ট্য হলো এ গান দলগতভাবে গাওয়া হয়। একজন মূল গায়ক বা বয়াতি থাকেন আর তার সাথে থাকেন তার সঙ্গী গায়ক বা দোহারগণ। দোহারগণ তার সাথে সমস্বরে সুর মিলান।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সারি গানের চর্চা হয়েছে। কিশোরগন্জ, ময়মনসিংহ, সুনামগন্জ, রাজশাহীর চলনবিল, পাবনা, বরিশাল, যশোর, রাজবাড়ী প্রভৃতি অঞ্চলে গাওয়া হয় সারি গান। সাধারণত খাল-বিল, হাওর, নদী অঞ্চলে সারি গান গাওয়া হয়। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে এ গান গাওয়ার ধুম পড়ে যায়। মধ্যযুগে কবিদের লেখায় সারি গানের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে নৌকা বাইচের সাথে সারি গান গাওয়ার প্রচলন হয়।

সারি গানকে কর্মসংগীতও বলা হয়। কারণ সারি গান সাধারণত বিভিন্ন পেশার সাথে সম্পর্কিত। একটা সময়ে কৃষকের ধান কাটার সময়, ধান তোলা, ছাদ পিটানো ইত্যাদি কাজের সাথে এই গান গাওয়ার প্রচলন হয়। কাজের ধরনের ওপর ভিত্তি করে সারি গানের বিভিন্ন নাম দেয়া হয়। যেমন—নৌকা বাইচের গান, ছাদ পিটানোর গান, ফসল কাটার গান ইত্যাদি।

যখন দলগতভাবে একই কাজ করা হয় তখন কাজে ছন্দ ও গতি আনতে সারি গান ধরা হয়। গানের ছন্দে আর তালে তালে সবাই মিলে একই সাথে নৌকার বৈঠা বাইতে, বাসাবাড়ির ছাদ পিটাতে, ভারি কিছু সরাতে সারি গান গাওয়া হয় ।

সাধারণত সারি গান দ্রুতলয়ে ও তালে গাওয়া হয়। তালের বিষয়টা যেহেতু আসল তাহলে এবার আমরা নতুন আরেকটি তাল সম্পর্কে একটু জেনে নিই। আমরা এবার কাহারবা তাল সম্পর্কে জানব।

কাহারবা তাল

কাহারবা ৮ মাত্রার একটি সমপদী তাল। এই তালে রয়েছে দুটি ভাগ, প্রতিটি ভাগে রয়েছে ৪টি করে মাত্রা। আমরা ১,২,৩,৪ । ১,২,৩,৪, গুনে অথবা ১,২,৩,৪। ৫,৬,৭,৮ গুণে কাহারবা তালের মাত্রা ৪।৪ ছন্দ প্রকাশ করতে পারি। প্রথম মাত্রায় তালি দিয়ে ১,২,৩,৪ এবং পঞ্চম মাত্রায় খালি বা ফাঁকা (তালি না দিয়ে) ৫,৬,৭,৮ গুণব। প্রথম মাত্রায় বা তালিতে ‘সোম’ এবং পঞ্চম মাত্রায় ফাঁক বা খালি। স্কুলে শরীর চর্চার সময় আমরা যে তালে তালে ‘ডান-বাম, ডান-বাম’ পা মিলিয়ে থাকি তা-ও কিন্তু চার মাত্রার ছন্দে করে থাকি।

কাহারবা তালের বোল

+					০				+
ধা	গে	তে	টে	।	না	গে	ধি	না ।	ধা
১	২	৩	৪	।	৫	৬	৭	৮ ।	১

সারি গান শুধু শ্রমসংগীত না, বরং গাওয়ার আনন্দ বা বিনোদনের খোরাক জোগায়। আবার প্রতিযোগিতার গান হিসেবেও সমাদৃত। গানের তালের সাথে অঙ্গভঙ্গীর প্রকাশ ঘটানোর জন্য এবার প্রথমে আমরা সারিভঙ্গি সম্পর্কে জানব।

সারিভঙ্গি

দলগত ভাবে একি ভঙ্গি করাটাই হল সারিভঙ্গি। সাধারনত কোনো একটি কাজ যখন আমরা দলগত ভাবে করি, তখন যে দেহ ভঙ্গিটা দেখতে পাই, সেটিই সারিভঙ্গি। এর সাথে শ্রমের একটা যোগসূত্র আছে। এক কথায় দলগত শ্রমভঙ্গি হলো সারিভঙ্গি। যেমন : অনেকে মিলে নৌকা বাওয়া, ছাদ পেটানো, কোনো ভারি জিনিস উপরে তোলার সময় যে শারীরিক ভঙ্গি হয় তা-ই সারিভঙ্গি।

আমরা কাহারবা তালে দলগতভাবে নিচের গানটা আনুশীলন করতে পারি এবং সম্মিলিত ভাবে গাইতে পারি সাথে সাথে দলের মধ্য হতে কেউ চাইলে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে গানের ভাবটি নিজের মতো স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারি।

নাও ছাড়িয়া দে, পাল উড়াইয়া দে

ছল ছলাইয়া চলুক রে নাও মাঝ দইরা দিয়া চলুক মাঝ দইরা দিয়া।। হো

উড়ালি বিড়ালি বাওয়ে নাওয়ের বাদাম নড়ে (আরে)।

আথালি পাথালি পানি ছলাৎ ছলাৎ করে রে।

আরে খল খলাইয়া হাইসা উঠে

বৈঠার হাতল চাইয়া হাসে, বৈঠার হাতল চাইয়া (হাতে)।।

ঢেউয়ের তালে পাওয়ের ফালে নাওয়ের গলই কাঁপে

চির চিরাইয়া নাওয়ের ছৈয়ায় রোইদ তুফান মাপে,

মাপে রোইদ তুফান মাপে

(আরে) চিরলি পিরলি ফুলে ভ্রমর-ভ্রমরী খেলে রে।

বাদল উদালি গায়ে পানিতে জমিতে হেলে রে

আরে তুর তুরাইয়া আইলো দেওয়া জিলকী হাতে লইয়া

আইলো জিলকী হাতে লইয়া।

শালি ধানের শ্যামলা বনে হইলদা পঙ্খি ডাকে

চিকমিকাইয়া হাসে রে চান সইশা খেতের ফাঁকে

ফাঁকে সইশা খেতের ফাঁকে

সোনালি রূপালি রঙে রাঙা হইল (আরে)।

মিতালী পাতাইতাম মুই মনের মিতা পাইতাম যদি রে

আরে ঝিলমিলাইয়া খালর পানি নাচে থৈইয়া থৈইয়া

পানি নাচে থৈইয়া থৈইয়া।।

আমরা কি আমাদের লোকগানের বিখ্যাত শিল্পী আব্বাসউদ্দিন আহমেদের কথা জানি? চলো আমরা তাঁর সম্পর্কে জেনে নেই—

আব্বাসউদ্দিন আহমেদ

আব্বাসউদ্দিন আহমেদ, যিনি ভাওয়াইয়া গানকে জনপ্রিয় করার জন্য কৃতিত্বের অধিকারী, তিনি ব্রিটিশ ভারতের কোচবিহার জেলার ১৯০১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে নদী কম। এ অঞ্চলে গরুগাড়ি চলার প্রচলন ছিল। গাড়োয়ান চলার সময় আবেগে গান ধরতেন। উঁচু নিচু রাস্তায় গাড়ি চলার সময়ে গলার স্বরে ভাঁজ পড়ত। গলার স্বরে ভাঁজ পড়ার বিশেষ গান গাওয়ার রীতিই ভাওয়াইয়া গান।

স্কুল-কলেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিতির মাধ্যমে সংগীতের প্রতি আব্বাসউদ্দিনের আগ্রহ গড়ে ওঠে। তিনি বিভিন্ন ধরনের গান করেছেন যেমন—ভাওয়াইয়া, জারি, সারি, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি, বিচ্ছেদী, দেহতত্ত্ব, পালাগান, লোকগীতি, আধুনিক গান এবং দেশাত্মবোধক গান। তিনি কাজী নজরুল ইসলাম, জসীম্‌উদদীন ও গোলাম মোস্তফা রচিত ইসলামিক বিষয়ের উপর গানও গেয়েছেন। কিন্তু আব্বাসউদ্দীন খ্যাতি লাভ করেন মূলত লোকগানের গায়ক হিসেবে। গ্রাম ও শহরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গেয়ে এবং তার গান রেকর্ড করে।

আব্বাসউদ্দিন রক্ষণশীল বাঙালি মুসলিম সমাজে সংগীতকে গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় করে তোলেন।
আব্বাসউদ্দিন ছিলেন প্রথম গায়ক যিনি কাজী নজরুল ইসলামের ও মন রমজানেরও রোজার শেষে' গানটিতে কণ্ঠ দেন, যা বাংলাদেশে ঈদ-উল-ফিতর উদ্যাপনের একটি অনিবার্য অংশ হয়ে ওঠে।
সংগীতে তার অবদানের জন্য তিনি প্রাইড অফ পারফরম্যান্স, শিল্পকলা একাডেমি পুরস্কার এবং স্বাধীনতা পুরস্কারসহ অনেক মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার লাভ করেন।

আর কতকাল ভাসব আমি
দুঃখের সারি গাইয়া
জনম গেল ঘাটে ঘাটে আমার
জনম গেল ঘাটে ঘাটে
ভাঙ্গা তরী বাইয়া রে আমার
ভাঙ্গা তরী বাইয়া।।

পরের বোঝা বইয়া বইয়া
নৌকার গলুই গেছে খইয়ারে।
আমার নিজের বোঝা কে বহিবে রে
আমার নিজের বোঝা কে বহিবে।
রাখব কোথায় যাইয়ারে আমি
রাখব কোথায় যাইয়া।।

এই জীবনে দেখলাম নদীর
কতই ভাঙ্গা গড়া
আমার দেহতরী ভাঙল শুধু
না যা দিল জোড়া।।

আমার ভবে কেউ কি আছে
দুঃখ কবো কাহার কাছে রে
আমি রইলাম শুধু দয়াল আল্লাহ রে
আমি রইলাম শুধু দয়াল আল্লাহ
তোমার পানে চাইয়া রে
আমি তোমার পানে চাইয়া।।

নোঙ্গার ছাড়িয়া নায়ের দেরে দে মাঝি ভাই,
বাদাম উড়াইয়া নায়ের দেরে দে মাঝি ভাই।
গাঙ্গে ডাইকাছে দেখ বান,
ওরে গাঙ্গে ডাইকাছে দেখ বান।।

হাল ধরিয়া বইসো মাঝি বৈঠা নেব হাতে
মোরা বৈঠা নেব হাতে।
সাগর দইরা পাড়ি দেব,
ভয় কি আছে তাতে রে মাঝি ভাই।।

উথাল পাথাল গাংগের পানি, আমরা না তাই ডরি
হায় রে আমরা না তাই ডরি।
সাগর পারে মাঝি মোরা.
সঙ্গী তুফান ঝড়ি রে মাঝি ভাই।।

হেইয় হো হেইয়া হো হেইয় হো হেইয়া হো
হোক না আকাশ মেঘে কালা
কিনার বহু দূর হায়রে কিনার বহু দূর
বৈঠার ঘায়ে মেঘের পাহাড়
কইরা দেব দূর রে মাঝি ভাই
আল্লাহ নামের তরী আমরা রসূল নামের ঘোড়া,
হায়রে রসূল নামের ঘোড়া।
মা ফাতেমা নামের বাদাম
মাস্তুলেতে উড়া রে মাঝি ভাই।।

যা করব—

- উপরের বক্সে গান দুইটির কথাগুলো পড়ব। এই গান দুইটি যে কোনো মাধ্যমে শুনব। তারপর ভাটিয়ালী ও সারি গানের বৈশিষ্ট্য জেনে উপরের কোনটি সারি আর কোনটি ভাটিয়ালি গান তা বইতে চিহ্নিত করব।
- নিজ অঞ্চলে কোনো আঞ্চলিক গান প্রচলিত আছে কি না জেনে নিয়ে অবশ্যই তা বন্ধুখাতায় লিখে রাখব।
- নিজ অঞ্চলের আঞ্চলিক গান ক্লাসে সবাইকে চাইলে গেয়েও শোনাতে পারি।
- আঞ্চলিক গানের সাথে কেউ চাইলে বিভিন্ন মুদ্রা ও চলনের মাধ্যমে নাচ চর্চা করে তা ক্লাসে পরিবেশন করেও দেখাতে পারি।
- শিল্পী আব্বাসউদ্দীন আহমেদের শিল্প সম্পর্কে আরো জানার চেষ্টা করব।

এই পাঠে আমি যা শিখেছি তা সম্পর্কে লিখি-